বিজয় দিবস

আনিসুজ্জামান

ষোলোই ডিসেম্বর সেই রক্তে রাঙানো দিন যেদিন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিজয়ের মহানন্দ সেদিন আমরা পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারিনি দুই কারণে- নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার এদেশীয় দোসরদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, বিশেষত বুদ্ধিজীবী-হত্যা, দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বন্দিত্ব। এক মাসের মধ্যেই অবশ্য বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় স্বদেশভুমিতে-শহীদেরা ফিরে আসেননি।

বড় মূল্য না দিয়ে বড় কিছু অর্জন করা যায় না- একথা আমরা বহুবার শুনেছি। পঁচিশে মার্চের কালরাতে যখন নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বরতম আক্রমণ শুরু হলো, তখনই আমরা স্বাধীনতালাভের জন্যে চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। ১৯৭১ এর দিনগুলি স্মরণ করুন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে বলে সন্তানের যাত্রাপথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন জননী। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সহযোদ্ধার লাশ নিরাপদস্থানে টেনে এনেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। প্রাণ গেছে, সম্ভ্রম গেছে, সম্পদ গেছে- তবু সংকল্পে অটল ছিল এদেশের মানুষ। তাই অপরিচিতজনকে ভাই বলে ঠাঁই দিয়েছে ঘর। যথাসাধ্য করেছে তার স্বপ্নের দেশকে বাস্তবের ঘেরাটোপের মধ্যে পেতে।

বাঙালির এই সংকল্প এবং সংগ্রাম সেদিন সারা পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। যেসব দেশের সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল কিংবা বজায় রেখেছিল অনৈতিক নিরপেক্ষতা, সেসব দেশের জনসাধারণও এগিয়ে এসেছিল এই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে। প্রবাসী বাঙালিদের প্রচারাভিযান, বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যস্বীকার-এসবকিছুই ছিল তার মূলে।

প্রায় এক কোটি লোক শরণার্থী হয়েছিল ভারতে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। সেখানে ঘাঁটি গেড়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যেরা, প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। সেখানে গড়ে উঠেছিল ভারত ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড, সেখান থেকেই পাওয়া গিয়েছিল আমাদের রাষ্ট্রের প্রথম স্বীকৃতি। আর এসবকিছুই সম্ভবপর হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে।

মুক্তিযুদ্ধকে যাঁরা ১৯৭১ সালের ন'মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেন, তাঁরা একদেশদর্শিতার পরিচয় দেন। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস থেকে যুদ্ধদিনের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের ধীরে ধীরে নিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশস্বরূপই তাই ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামকে দেখতে হবে।

১৯৭১ থেকে আজ আমরা চলে এসেছি ৩৮ বছর দূরে। তাই বলে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছে বিগত দিনের ইতিহাসমাত্র নয়। মুক্তিযুদ্ধর চেতনা আমাদের মধ্যে নিত্যপ্রবাহমান-শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও। পরবর্তীকালে যেসব বিকার আমাদের পদে পদে বিড়ম্বিত করেছে, আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে আমাদের ১৯৭১ এর কাছেই যেতে হবে।

-০২-

কিন্তু এর একটা অন্যদিকও আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন আছে, তেমনি আছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি। অন্তরে চেতনা ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। সেদিনকার নতুন জাতিগঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ পুরোপুরি সফল হবে না। ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা শত্রুমুক্ত স্বদেশ পেয়েছি, কিন্তু এই ৩৮ বছরেও আমরা নিজেদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে বাস্তবলোকে পাইনি।

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের সেই ডাক দিচ্ছে। শহীদেরা, মুক্তিযোদ্ধারা যা করবার, তা করেছেন। তাঁরা এই বিজয় দিবস আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখন বাকি কাজ আমাদের করতে হবে। যে-চরম আত্মত্যাগ মানুষ করেছে ১৯৭১ সালে, তার মর্যাদা রাখতে হবে অসাম্প্রদায়িক, ন্যায়পরায়ণ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলে।

১৯৭১ সালের পরে ন্যায় ও আদর্শের জন্যে আর আত্মাহুতি দেওয়ার কথা ছিল না মানুষের। অবস্থাবৈকল্যে মানুষ তাও দিয়েছে। তারা আত্মাহুতি দিয়েছে সুখী, সমৃদ্ধ, প্রাগসর বাংলাদেশের জন্য। তাদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, যেমন অপরিশোধ্য ঋণ মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের কাছে কিংবা তারও আগের ভাষা আন্দোলন কিংবা গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের কাছে। তাঁদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না- একথা আমরা বহুবার বলেছি। কবে আমরা বলতে পারব, তাঁদের রক্ত বৃথা যায়নি। ১৬ ই ডিসেম্বরে একবার সত্যিই সেকথা বলতে পেরেছিলাম। এখন কাজ করে, দেশ গড়ে, দারিদ্র-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য দূর করে বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে।

-০০-

বিজয় দিবসে কী কথা হয়

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

তারপরে কেটে গেল চার দশকের কাছাকাছি সময়কাল। সন ২০০৯, ক্যালেন্ডারের পাতার দিন তারিখ মোতাবেক আজ ডিসেম্বর ১৬; স্বাধীন 'নেশন স্টেট' বাংলাদেশের বিজয়দিবস। বিশেষ এই দিনে পনোরো কোটি বাঙালি জনমানুষ আমরা উদযাপন করছি, দখলদার পাকিস্তানি অপশক্তিকে হটিয়ে লড়ে-নেয়া 'মুক্তির সেই একাত্তর'। আর এখন এই একই সাথে পাঠ নেব আমাদের বিজয়দিবসের ইতিহাসে।

বটে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে হাজারো সঙ্কট, বিভ্রান্তির জটাজাল- অবস্থাননির্বিশেষে আপামর সাধারণের তা নিত্যদিনের পীড়ন। বাহুল্য বলা যে, সমস্ত দেশ উদ্ধারের লক্ষ্যে আশু এক বিরাট কর্মযজ্ঞ-আয়োজনের প্রয়োজন। তবে উপস্থিত এই ড়্গণে আমাদের জরুরি সন্ধান অন্যত্র। বিবেচনা করছি-বারংবার সেই সন্ধানের সত্যটিকেই চিহ্নিত করবার প্রয়াস নিতান্তই ফরজ। যে সত্য-সন্ধানের জন্যে আবেদন, বিষয়টা কিন্তু তদর্থে জটিল নয়। আমাদের সন্ধানের প্রস্তাব-কেন 'বাংলাদেশ'? কী প্রকারে সম্ভূত 'মুক্ত স্বাধীন' বাংলাদেশ? এইখানে আমরা অবশ্য বুঝে নেব- তা' উপরিতলের তাৎক্ষণিক একটা ব্যাপার/কা- নয়। গভীরে কাজ করেছে, অনেকদিন ধরে অতিনিষ্ঠায়, ব্রতে সাধিত হয়েছে সেই কাজ- একটি বিশ্বাস, ঈমানের আবিস্কার এবং তাই থেকে জাত আপসহীন চেতনা, তার নাম 'বাংলাদেশ চেতনা'। অতঃপর জানি, ঐ ঈমানের চেতনায় প্রাণিত মানুষেরা লড়াই করেছিল। সেইটেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এখন ইতিহাসবিদরা, পোলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। মৌল কার্যকারণসমুহ আবিস্কার করবেন। আর সাধারণ আমরা আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা জানাব ঘরের নবজাতক সন্তানদেরকে। সেই সময়ের আমরা, আমাদের জন্য তা ছিল রূঢ় বাস্তবতা, যাকে বলব জীবনসত্য। ভূমিসংলগ্ন আমাদের কিন্তু আপন বুঝেই জানা ছিল-কেন বাংলাদেশ। জানা ছিল-ঈমানে কেন ঐ চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কণ্ঠে কেন প্রার্থনার মতো উচ্চারিত হত 'জয় বাংলা', দুঃসাহসী রণধ্বনি 'জয় বাংলা'। চেতনাটি রক্তে মিশেছিল। তাই থেকে কী দ্রুত জয় করে নিয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর চিহ্নিত'৭১-এর ঐতিহাসিক দিবসটি। রোমাঞ্চিত হই যখন মিলে যায় প্রায় দুই শতাব্দী কাল পূর্বকার ফরাসী বিপ্লবের সাথে। ওদের কণ্ঠেও ত' বিশ্বাসের আওয়াজ ঐ রকমেরই ছিল 'ঠরাব খবর জবাড়ষঁঃরড়হ ঋৎধহপধরংব. ইতিহাসের পাঠক অবগত ফরাসী বিপ্লব শেষ অবধি বিশ্বমানসের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। এখন ক্ষোভের কথাটি এই-আর বাংলাদেশে? মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব করেছে যে দেশকে, সেই খানে? সেখানকার মানুষগুলির বরাতে ঘটল কী? একপ্রকারে 'বরাতই বটে। তখনকার সমকালীন আমরা, মুক্তিযুদ্ধসম্পৃক্ত আমাদের তাবৎ চেতনা-মূল্যবোধ ইতিমধ্যেই কী বিস্মৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়ে এসেছে। কেমন এক ওলট-পালট বিকৃতির ঘোরে সমস্ত কিছুই যেন নিমজ্জিত হচ্ছে। আর বর্তমানের এই নবীন প্রজন্ম? বেশ চতুর, কুটিল মতলবে তাদের মগজ-ধোলাই ক্রিয়াটি সাধন করা হয়েছে। তারা জানছে আরেক ইতিকথা। তারা জানছে না তাদেরই পিতাদের সমুদয় মহৎ কীর্তির কথা। বরং বিপরীতে ঐতিহ্যহীন, বংশপরম্পরাবিচ্যুত একটি প্যারাসাইট মানবগোষ্ঠী নির্মাণের সর্বাত্মক অপপ্রায়াস চলছে। ঈশ্বরের অপার করুণা- এমত দুঃসময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা অর্জনের স্মারক দিবস। সে কারণেই নিবেদন- এখন মাহেন্দ্রড়্গণ দর্পণে আপন মুখদর্শনের, উঠে দাঁড়াবার, '৭১-বিরোধীকে প্রতিহত করবার এই বর্তমানে এবং বাংলাদেশ-বাঙালিত্বের চেতনায় উজ্জীবিত হবার। আর অতিসঙ্গত হেতুতেই বারংবার আসবে এই সব প্রাসঙ্গিকাতর প্রশ্ন ঃ মুক্তিযুদ্ধ-মুক্তিযোদ্ধা;'৭২-এর সংবিধান; '৭৫ আগস্টে জনকহত্যা; ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ; দেশে সামরিক শাসন-ক্যু কাউন্টার ক্যু; রাজার পুনর্বাসন; স্বৈরশাসনের পর্ব; স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলনের জয়; এবং অতঃপর।

যখন বলি মানুষের অধিকার, মানুষের মুক্তি-বিশেষ বর্তমান প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়টি গভীর, পটভূমি ব্যাপক। সামগ্রিকতায় তা বিস্তারিত আলোচনার অপেড়্গা রাখে। সহজ বুঝ -এর কথায় এইভাবে উপস্থাপন করা যাক। প্রাকৃত সাধারণের মুক্তি-লোপাটকারী শক্তির শাসন-শোষণ থেকে, দাসত্বের দখলাদারিত্বের নিগড়-নিপীড়ন থেকে। ইতিহাস বলে, যুগে যুগে দেশে দেশে শৃঙ্খলিত করবার প্রক্রিয়াটা

-০২-

মোটামুটি একই প্রকারের। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় আবরণে আগ্রাসন। সেইখানে এসেছে সম্রাট, সেনাপতি, চার্চ, সামন্তপ্রভু, বণিক-শিল্পতি। মতলবে জোট বেঁধেছে কায়েমী স্বার্থের যত প্রতিনিধি। মূল উদ্দেশ্য, ঐ যে বলা গেছে, সাধারণ মানুষকে দাসবন্দিত্বে আটক করে অবাধ শোষণ। ওদিকে তেমনি কালে কালান্তরে নানান দেশেই সর্বমাত্রিকায় মুক্তির লক্ষ্যে মানুষেরা সংগঠিত হয়েছে, প্রতিরোধ আন্দোলন-বিদ্রোহ করেছে, শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র লড়াই করেছে। দূর অতীতে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে-স্পার্টাকাস বিদ্রোহের কথা আমরা পাঠ করে জেনেছি। সেই থেকে অদ্যাবধি কত না উত্থানের, বিপ্লব-বিদ্রোহের ইতিহাস। বিংশ শতকের অপরাহ্নে দেখেছি ভিয়েতনামে হো চি মিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা-এঁরা সব নেতৃত্বে দিয়েছেন নানান চেহারার প্রভুত্ববাদের মুকাবিলায়। বঞ্চিত দলিত কোটি সাধারণের মুক্তির জন্যে। এখন বুঝে নিই এই আমাদের দেশেও তেমনি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির লক্ষ্যে যুদ্ধ।

হঠাৎ করেই ত' আর ইতিহাসের সৃজন হয় না। তাৎড়াণিক চরম উত্তেজনায় বিস্ফোরণ সংঘটিত হতে পারে। তবে তা সাময়িক, ড়াণান্ত্মরে মিলিয়ে যায়। অপর পক্ষে, আমাদের '৭১ অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস-গর্ভ কীর্তি। সারাটা দেশজুড়ে যে বিশাল গণঅভ্যুত্থান, অনেক রয়েছে পশ্চাদ্‌পটের গভীরে, ফল্গুস্রোতের বহমানতায়। আর ইতিহাস যখন থেকে উপরিতলে দানা বাঁধছে আমরা তা নিকট প্রত্যক্ষ করেছি। অনেকেরই রয়েছে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা। প্রসঙ্গত এইখানে একটি রূপরেখা উপস্থাপিত করা যাক। বিশেষ করে বর্তমান জামানার মানুষদের জন্য-

বলব যে, যথার্থ ইতিহাসের যাত্রারম্ভ'৪৮-'৫২র ভাষা আন্দোলন দিয়ে;
পঞ্চাশের দশকে চট্টগ্রামে, কুমিলস্লায়, ঢাকায় এবং টাঙ্গাইলে কাগমারীত অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলন। ক্রমেই স্পষ্ট করে জানা যাচ্ছে আপন ঐতিহ্যের ঠিকানা; আমাদের চেতনাসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে হাজারবছরের বাংলার বহমান সংস্কৃতি-সম্ভারে;
'৫৪-র নির্বাচনে পাকিস্ত্মানিত্বের নিশানবরদার মুসলিম লীগের ভরাডুবি। এই ঘটনা পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের তৎসহ আর্থ-অধিকারের আন্দোলন সূচিত করে দেয়;
'৬১তে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, এবং দশকজুড়েই রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন, যা কিনা বাঙালিত্বের চেতনাকে জাতীয়বাদী করে তুলতে সহায়ক ভূমিকায় কাজ করেছে;
৬২'তে শরীফ শিড়্গা কমিশন রির্পোটের প্রতিবাদে তীব্র ছাত্র আন্দোলন;
৬৬'থেকে ছয়দফা দাবি অর্জনের আন্দোলনের দেশব্যাপী ক্রমবিস্তার;
৬৮'তে ৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান তুঙ্গে পৌঁছে গেছে;
অতঃপর কেমন দ্রুত ঝাঁপিয়ে এল ৭১-এর অগ্নিঝরা মার্চ। বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের, আর তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ - 'এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। অতঃপর মাত্র সপ্তাহ তিনেকের মত কালব্যবধানে আমরা পৌঁছে গেলাম সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে।

এ ত কেবল কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি মাত্র নয়। এ যে ইতিহাসের রথ-পরিক্রমার স্তর থেকে স্তরান্তরে উত্তরণের চলচ্চিত্র। একই সাথে মিলিয়ে নিতে হবে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অন্তরে কেমন করে বিশ্বাসের শেকড় প্রসারিত হচ্ছে, মূলে তা প্রোথিত হচ্ছে। তার উচ্চারণ শ্রবণ করি বিশেষ তাৎপর্যবাহী এইসব বাণীবন্ধে ঃ 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'জয় বাংলা', 'বাংলার জয়', 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি এবং চূড়ান্ত গিয়ে সব মিলিত হচ্ছে এ মোহনায়, সেখানে মরণজয়ী প্রেরণার ঐ রণধ্বনি 'জয় বাংলা'। লক্ষণীয় যে, বারংবার ফিরে ফিরেই আসছে মাতৃভূমি বাংলার কথা, মানুষ বাঙালির কথা।

-০৩-

স্বাধীনতার নবযাত্রা

হারুন হাবীব

নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই জানতে হবে, তাঁদের প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার যাত্রাপথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সে পথ ছিল সংকট ও ভয়াবহ বিপদসংকুল। স্বাধীনতার পরবর্তী কালটিও কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি বাংলাদেশের। এই যে চারদশক পাড়ি দিতে চলেছে বাংলাদেশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর, এই সময়ে আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এ দেশকে। পরিকল্পিত আক্রমন পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর, রক্তার্জিত স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ধুলিস্মাৎ করার সর্বাত্বক ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছিল। শক্ত জাল বুনেছিল স্বাধীনতা বিরোধীচক্র সেদিন। কিন্তু সহযোগী ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় সে ষড়যন্ত্রের সফল মোকাবিলা করেছিল যুদ্ধপরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকার। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শেষপর্যন্ত অপ্রতিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই, বাংলার স্বাধীনতাকে সুসংহত করতে দেয়নি প্রতিপক্ষরা। স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই ওরা সক্রিয় হয়েছিল নতুন উদ্যমে।

সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাভাবিক ইতিহাসের যাত্রাপথ প্রথম রুদ্ধ করা হয়েছিল ১৫ অগাষ্ট ১৯৭৫ ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর সড়কের ভয়ংকর রক্তপাতের মাধ্যমে। এ হত্যাকান্ড ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম পরিকল্পিত আঘাত। বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতালাভ করেছিল একটি রক্তাক্ত গণযুদ্ধের মাধ্যমে, সে বাংলাদেশের কাছে এ আঘাত ছিল সীমাহীন। এ আঘাতের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ৩৪টি বছর কাটাতে হয়েছে বাংলাদেশকে। পেরোতে হয়েছে অনেক চড়াই উৎড়াই। কাজেই ১৯ নভেম্বর ২০০৯, যেদিন সুপ্রিম কোর্টের আপীলবিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যামামলার রায় প্রদান করেছে, সেদিনটি কেবল ঐতিহাসিক দিনই নয়, একই সঙ্গে বদ্ধদুয়ার খুলে দেয়ার জাতীয় ঐতিহাসিক নবযাত্রার।

ইতিহাস আজ নিজের প্রয়োজনেই অজেয় শক্তি নিয়ে মূর্তিমান। জাতীয় নবযাত্রার শক্তগ্রন্থি খুলে গেছে । বাংলাদেশ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। যে ঘাতক-তস্করেরা বাংলাদেশের জনক ও লক্ষশহীদের আত্মত্যাগকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পঁচাত্তরের রক্তপাত ঘটিয়েছিল, যারা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বাভাবিক গতিপথ স্তব্ধ করতে ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, তারা আজ ইতিহাস ও আইনের হাতে সমর্পিত ।

ইতিহাসের বিচার অমোঘ। বাংলাদেশের জীবন থেকে ৩৪ টি বছর খ'সে গেছে। এ দেশের মাটি ও মানুষ ব্যর্থতার দুঃসহ যন্ত্রনার প্রহর গুনেছে প্রায় তিনযুগ। যন্ত্রনাবিদ্ধ বাংলাদেশ গুমড়ে কেঁদেছে বছরের পর বছর। কিন্তু সে কান্নার পর নবযাত্রার শুরুটিও কি কম তাৎপর্যমন্ডিত ?

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশলক্ষ মানুষের আত্মদান যে নতুন অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারই রোদনভরা বেদনা পঁচাত্তরের রক্তপাত। জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে পুরনো পাকিস্তানী ধারায় ফিরিয়ে দিতে ঘটানো হয়েছিল ১৫ আগস্ট। কারণ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড নিছক বা কিছু ব্যক্তির নিহত হবার ঘটনার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল ধর্ম ও সেনা-কেন্দ্রিক দুঃশাসনের পাকিস্তানকে টুকরো করে একটি আধুনিক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগড়ার দায়ে !

পাকিস্তানের ২৪ বছরের দুঃশাসনের পর ১৯৭১ ছিল পূর্ব অংশের নিপীড়িত বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর একটি সুখস্বপ্ন। সেনাতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের নিপীড়ন, সেই সাথে সেনা-শাসকদের উদগ্র দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এ দেশের নিপীড়িত বাঙালী জনগোষ্ঠীকে রঙিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সে স্বপ্নের দ্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই পঁচাত্তর ছিল স্বাধীনতাবিরোধী গোপন ও প্রকাশ্য শত্রুদের একটি সম্মিলিত প্রতিশোধ। নতুন রাষ্ট্রকে আতুর ঘরে গলাটিপে মারার সর্বাত্বক অভিযান।

-০২-

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রতিমুহূর্তে পঁচাত্তরের পর থেকে। ব্যর্থতার জ্বালায় ঝলসে গেছে স্বাধীনতার রঙ্গিন স্বপ্ন। গণতন্ত্র ও সুশাসনের বদলে এসেছে দুর্ভাগ্যজনক একটি সময়। যে রুগ্ন পাকিস্তানী চেতনাকে বহিস্কার করতে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, সেই গণবিরোধী রুগ্ন রাজনীতি-দর্শনকে এবং ধর্মব্যবসায়ীদের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পঁচাত্তর পরবর্তীকালে। সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রধর্মবাদের পুনরাভিযান সুনিশ্চিত করেছে এই সামরিক ও আধা-সামরিক শাসকবর্গ। নির্বাচনকে পরিণত করেছে অগণতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘায়িত করার কৌশলে। বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বললেও মূলত ওরা প্রতিষ্ঠিত করেছে সেনা-নিয়ন্ত্রিত এমন এক দুঃশাসন, যাকে মুক্তিযুদ্ধের মাঝ দিয়ে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

ইতিহাস সততার স্বার্থেই মানতে হবে, পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে জড়িত ছিল পরবর্তীকালের এইসব কুশিলবরাও। জাতির নতুন যাত্রাপথ কণ্টকহীন করার স্বার্থেই এদের চিহ্নিত করা জরুরি। ইতিহাস সততার স্বার্থেই এ সত্য পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, এই এরাই বাংলাদেশ সৃষ্টির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ভুলুণ্ঠিত করেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আত্মাকে অস্বীকার করে বাঙালী জাতিসত্বাকে আঘাতের পর আঘাত করেছে। বাঙালির যা কিছু অর্জন, যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলের তাকেই এরা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। বিকৃত করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যন্ত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু জেনারেশন যারা জাতীয় ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্ত। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই নতুন প্রজন্ম জাতীয় মর্যাদার প্রতীক নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ভবিষ্যত গড়ে তুলবে । কিন্তু পরিকল্পিতভাবে তাদের পঙ্গু করা হয়েছে।

বলতেই হবে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড মামলার চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাভাবিক যাত্রাপথের প্রধান কাঁটাটি দূর হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটিও সত্য যে, বাংলাদেশ এখনো নিরাপদ হয় নি। এ দেশকে নিরাপদ করতে চাই দৃঢ়চিত্ত আদর্শিক নেতৃত্ব। আমি বলতে বাধ্য, যে নবযাত্রায় জাতিকে আজ ধাবিত করতে হবে, সে যাত্রায় আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের অবশ্যই মানতে হবে যে, একাত্তরের খুনি, পরাজিত পাকিস্তানী প্রেতাত্মা এবং পঁচাত্তরের খুনীরা ভিন্ন কোনো সত্বা নয়। একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ এরা। এরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে খুনি কেউবা পরোক্ষে। এদের কেউ বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির চাপে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও বাংলাদেশের জন্মের আদর্শিক চেতনা এদের কাউকে কখনো উদ্বুদ্ধ করেনি। কাজেই সত্যসন্ধানী গণতান্ত্রিক মানুষকে আজ একই সঙ্গে ঘৃনা করতে হবে খুনিদের দোসরদেরও, যারা একাত্তর ও পঁচাত্তরের খুনিদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছিল, বাংলাদেশের গণমানুষের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসবিরোধী অপচেতনার পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল এবং দেশে জঙ্গীবাদের ভিত্তি সূচিত করেছিল।

১৯ নভেম্বর ২০০৯ সুপ্রিমকোর্টের আপীলবিভাগের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সাংবিধানিক মর্যাদা ও আইনের শাসন পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ রায়ে আবারও প্রমান হয়েছে, আধুনিক রাষ্ট্র চলবে তার সংবিধানের আওতায়, রাষ্ট্রক্ষমতার বদল হবে ভোটের মাধ্যমে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে, সেনাবাহিনী বা তার বিচ্ছিন্ন কোনো অংশের হঠকারিতায় নয়।

কাজেই এ রায়ের মধ্য দিয়ে যে নবযাত্রা সূচিত হয়েছে তাকে অধিকতর নিরাপদ করাই এখনকার বড় কাজ। মনে রাখতে হবে, যে রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতাসীন তাদের সামনে আছে সুবিশাল দায় ও দায়িত্ব। একই সঙ্গে আছে

স্বাধীনতাবিরোধীদের সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের প্রতিপক্ষরা কিছুতেই এ রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল দেখতে চায় না। নব্য পাকিস্তানীরা লক্ষশহীদের রক্তেগড়া বাংলাকে ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। কাজেই সর্বাত্মক সতর্কতা সময়ের দাবি। বিন্দুমাত্র আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। নবযাত্রার যে আয়োজন তাকে দৃঢ়চিত্তে ও সুদৃঢ় পদভারে এগিয়ে নিতে হবে। কোনো দ্বিধাদন্দ্ব নয়, এ দেশের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করতে সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ বিচার বাংলাদেশকে আরও অধিকতর নিরাপদ করবে। প্রিয় বাংলাদেশ অবশ্যই প্রার্থীত এ নবযাত্রায় সফল হবে, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে -এ আমার বিশ্বাস ।

-OO-

খবর ডট কম

জীবনের যাবত জলকণা

সৈয়দ শামসুল হক

হে বিষন্ন বিখচিত জীবন, সমস্তটাই মুছে দেবার বা যাবার মতো নয়- আকাশ বা উদ্যান।
বাগান এখনো বারোমাসই ফুল ফোটাতে উদগ্রীব, আর আকাশটাও ঝুঁকে দেখছে মুখ- এখনো।
চাই শ্রম, চাই পাখি, চাই রৌদ্র, চাই বীজ- এই সব চাওয়ারও কোনো বিরতি বা বিরাম নেই।
বিষয়ের শেকড়ে কুড়োল চালিয়ে উৎসন্ন উৎখাত করতে যে-সকল দিনমান থাকে ওঁৎ পেতে,
তাদের বিরুদ্ধে আমি তো এখনো দাঁড়িয়েই আছি আয়নায়, দেখে নিও প্রতিবিম্বে তুমি নিজেকে।
কিন্তু ওই প্রতিবিম্বে আরো যে কেবলি ছবি পড়ছে- অসুস্থতার ও অন্ধকারের, আর হয়ে যাচ্ছে
হিসেবের গোলমাল, যোগের সঙ্গে বিয়োগের, ভাগের সঙ্গে গুণের, সরল রেখার সঙ্গে বক্রতার,
তার ওপর দিয়ে অনবরত কালো কালো পাখির ঝাঁক, তাদেরও আমি নামতে দেখছি বিক্রমে।
নখরে তারা চিরে ফেলছে নড়্গাত্রের বীজ আর ওঙ্কারটিকেও তারা ভরিয়ে দিয়ে চলেছে কা-কা রবে।
এ সবই যে আমার গ্রন্থনার বিরুদ্ধে, তোমার মুখশ্রীর ওপর বলাৎকারের লড়্গো সেটা বলাই বাহুল্য।

আমি তো সন্তুষ্ট থাকতে পারি নি আমার বসন বা ব্যসন নিয়ে, সে কথাও অবিদিত নয় কিছু।
কেন যে আমি বমনমুখী রোগীর মতো বারবার উগরে ফেলে দিতে চেয়েছি এইসব, আর
সবুজ ঘাসের শিষ দাঁতে কেটেছি নিরাময় পেতে, অড়্গারের ভেতরে উদ্যান ও আকাশ পেতে,
তার সংবাদ তুমি রেখেছো কি রাখো নি, সন্ধান কোরো তোমার হীরকদ্যুতি জলধারার ভেতরে।
সেই জল যেদিন আমি তৃষ্ণায় প্রথম চেয়েছি, আর তুমি যে চিৎকার করে উঠেছিলে- তফাৎ!
এখন সেই জলধারা ভিজিয়ে চলেছে পৃথিবীর যাবত কৃষ্ণ ঠোঁটসকল, সেটাও তো আমি দেখছি!
সেই প্রথম দিনেই তুমি তোমার অগ্রাধিকারটি প্রদর্শন করেছিলে ওভাবেই। আর আমি!- আমি!-
প্রান্তেরও ওপারে এক আশাহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বয়ন করতে শুরু করেছিলাম বস্ত্র যার নকশাগুলো
খচিত রচিত হতে থাকলো বিপুল এক ক্রোধের চুমকি ও ভালোবাসার কার্পাসজনিত সুতোয়।
আমি তা দিয়ে পতাকাও একটি বানিয়ে নিয়েছিলাম, হে বিষন্ন বিখচিত জীবন, তোমার রাষ্ট্রের।

দ্যাখো আমি তোমার ছায়াটিকে সঙ্গে নিয়েই একাকীজনের মিছিলে আজও চলেছি পতাকাবাহী।
আমার মানচিত্রের ভেতরে বিরাগ বা বিচ্ছেদের খাদ কিংবা শংকার কোনো পাহাড় আঁকা নেই।
ভেতরের তুমুল চিৎকারগুলোকে আমি অবিরাম বিমুক্ত করে চলেছি আমার বাকযন্ত্র কি বাক্য থেকেই-
আর প্রতিদিনের জিহ্বায় আমি তাদের উচ্চারণযোগ্য করে চলেছি এই বোবা মানুষের গ্রামসকলে।
সমস্তটাই মুছে দেবার বা মুছে যাবার মতো নয়! অমোচ্য কালি ও দেবগণের কলম আমার প্রার্থনায়।
আমি কুসুম সংগ্রহ করে চলেছি এখনো, আর এখনো আমি মাল্যের প্রতিভা নিয়ে সুঁচসুতো হাতে।
প্রান্তর উজাড় উৎসন্ন হলেও এরই শেষপ্রান্তে কিন্তু পড়ে আছে তোমারই দীর্ঘটানের ছায়াটি।
হে বিষন্ন বিখচিত জীবন, হে জীবনবেদের দেবীকাঠামো, তুমি স্থাপিত হও সমুখে- এসো এবং
আমার হাতেই গ্রহন করো মৃত্তিকা, নাও তুমি চোখ ফোটাবার তিসিতেল, উন্মোচিত হও দেবী।
আমি তোমারই আরাধনায় একটি জীবন- আর এ জীবনে তুমি বিনা কেইবা আছে আর আরাধ্য?

মুক্তির মাস, বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

বেলাল চৌধুরী

মার্চে যে-বীজ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সারাদেশের মাটিতে
দশমাস দশদিনেরও কম, মাত্র ন'মাসেই
ডিসেম্বরে এসে সে-ফসল গোলাজাত করা হল ঘরে ঘরে,
মুক্ত আকাশে উড়ল বাংলা ও বাঙালির জয়পতাকা;

উদয়ের পথ রাঙা হল নব সূর্যের চোখ ধাঁধানো আলোয়
--সেই থেকে ডিসেম্বর মানে মুক্তির মাস, বিজয়ের মাস।
অমারাত্রির কথা কেইবা রাখে মনে-- কালরাত্রি শেষে তাই
চারিদিকে সাজ সাজ রঙিন কাগজ ওড়া, সঙ্গীন ওড়ানো বিজয়োল্লাস!

ধানী-রঙে-ধোয়া স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকাবাহী
হাতে হাত কাঁধে কাধ মিলিয়ে উত্তাল তরঙ্গায়িত মুক্ত জনসমুদ্র
পাকা ফসলের ঘ্রাণমাখা রক্তসিক্ত রিক্তশাখা-প্রশাখা বিরাণ প্রান্তরে
কে কাকে ডাকছে কাছে দূরে বাংলার ভিতরে বাহিরে

সবাই বজ্রমুষ্টি, মুক্তির সনদ হাতে ছাত্র শিক্ষক কৃষক মজুর
দিবারাত্র মুক্তির অতন্দ্র যোদ্ধাদের হাঁক।
কোথায় হে রায়রায়ান জীবনান্দ শেখ মুজিব-
সাড়ে সাতকোটি কোকিলের কলরবে মুখরিত বাংলার নিসর্গ;

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
সারাদেশে ম্লানমুখ পশুপাখি, ম্রিয়মাণ ফুলফল বাংলার
ঘরছাড়া ন'মাস করেছে তাড়া--কত কান্না, যে জমাট বেঁধে নিরেট পাথর
পলকা টোকাতেও নেমে আসবে অবরুদ্ধ প্লাবনের তোড়,
বুকের গভীরে রক্তজবা যে-ড়্গত তার রঙ, আবিস্কারের সীমানা পেরিয়ে
ভয় বা বিস্ময় নয়--আজ শুধু বাঁধভাঙ্গা হাসিকান্না আলিঙ্গন
মুজিব জীবনানন্দের রূপসী বাংলায়
সব নদী--জীবনের সব লেনদেন মিটিয়ে ফেরার পথে
ঘরমুখো বাংলামায়ের দামাল ছেলেরা;
জয়বাংলা ধ্বনিতে উঠেছে মেতে আবহমান বাংলা ও বাঙালি।

-০০-